ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1265-1271
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.346

রবীন্দ্র সাহিত্যে বাউল দর্শনের প্রভাব

সন্দীপ কুমার পতি, *গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Baul tradition represents a distinctive spiritual stream within the cultural and philosophical heritage of Bengal. At its core lies the search for the *"Moner Manush"*—the inner or eternal being within the human self. Baul practitioners emphasize a human-centred mysticism that prioritizes personal spiritual experience over formal doctrines, scriptures, or ritual practices. The human body and inner consciousness are regarded as the primary locus of spiritual realization. Through disciplined practice, music, and reflective insight, the seeker attempts to discover the divine presence within oneself. In this sense, Baul philosophy promotes self-knowledge and spiritual freedom beyond caste distinctions, social hierarchies, and rigid religious identities.

The songs of the renowned Baul mystic Lalon Shah express this humanistic vision by questioning social divisions and emphasizing the unity of human existence. Baul thought also reflects influences from Sahajiya Vaishnavism and Sufism. The tradition significantly influenced Rabindranath Tagore, who helped introduce Baul ideas and songs to the wider intellectual world. Thus, Baul philosophy presents a unique vision of spirituality grounded in inner realization, love, and human unity.

Keywords: Baul Philosophy, Moner Manush, Lalon Shah, Rabindranath Tagore, Humanistic Mysticism, Spiritual Self-realization

রবীন্দ্র সাহিত্যে নানা ভাবনার এক সঙ্গম ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ যদিও দার্শনিক নয় বরং কবি বলে ভাবতেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তথাপি তাঁর কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে নানাবিধ দর্শন ভাবনা। বিশেষত তার ধর্ম ভাবনা পুষ্ট হয়েছে নানা ভাবের স্রোতস্বিনী ধারার মধ্যে। ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম ভাব যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সহজিয়া বৈষ্ণব বাউল ভাব। বিশেষত তার জীবন যতই উত্তর পর্বে অগ্রসর হয়েছে ততই যেন অন্যসব ভাবকে ছাড়িয়ে সহজিয়া বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও বাউল ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে তার রচনায়। দেহ-গেয় বোধ 'মনের মানুষের' ধারণা উপোচারিক ধর্মের প্রতি অনীহা সর্বত্রই বাউল দর্শনের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করি আমরা। লালন ফকির থেকে গগন হরকরার ভাবনা রবীন্দ্র কবি মানুষকে কতখানি উজ্জীবিত করেছে তা প্রকট করে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বাউল উদাসীন সংসার মোহ মুক্ত। আবার বাউলকে আমরা সাধনাও বলতে পারি। যেকোনো ধর্মের মানুষ বাউলের সাধনা করতে পারে। বাউলের সাধকরা ঈশ্বর-পাগল। 'মনের মানুষ'- এর কথা বলেন বাউল সাধকরা। এই মনের মানুষ হলো মানুষের অন্তঃস্থিত মানুষ, মানব দেহেই তার আধার। এই মনের মানুষকে

উপলব্ধি করাই বাউল সাধনার প্রধান লক্ষ্য আর এই মানব দেহেই হলো সেই সাধনার প্রধান আশ্রয় ও আধার।বাউলরা বিশ্বাস করেন যে সঠিক ভাবে সাধনা করা গেলে এই দেহেই সেই মনের মানুষের সাথে মিলন ঘটবে। বাউল এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এক বিশেষ গোষ্ঠী হল সাঁই দরবেশ।বিশিষ্ট বাউল সাধক সিরাজ শাহ ফকির এর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বাউল জগতের এক অদ্বিতীয় রত্ন লালন। যিনি ছিলেন এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারের সন্তান। 'লালন'শব্দেরঅর্থ প্রিয় শিষ্য।তিনি লালন শাহ ফকির নামে দশ হাজার শিষ্যের গুরু হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তার তিরোধানের বহু বছর পরও আজও তারঁ অজস্র গান বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বর্তমান।

বাউলরা কোন ধর্ম কিংবা কোন ধর্মের সাথে জড়িত গ্রন্থকে মানেন না। তাদের কাছে ঈশ্বর, দেব-দেবী, আল্লাহ কোনটারই কোন মানে নেই। তবে তাদেরকে ঠিক নাস্তিকও বলা যায় না। বাউলরা বিশ্বাস করেন এক চিরন্তন সত্তায় যা মানুষের অন্তরে বাস করে। এই জায়গাতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বাউলদের মিল পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ওপর বাউল তথা লালনের দর্শন চিন্তার বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরেই লালন ফকিরের বহু গান বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্যেও বাউল দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে বাউল সংগীত- "খাঁচার ভিতর অচিন পাখী"[১]-এর সংযোজন। বাউল সাধনার অন্তর্নিহিত মানব কেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক যে সুর রবীন্দ্রনাথের চেতনায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল তা এর থেকেই বোঝা যায়।

অন্যান্য সাধনার মতোই বাউল সাধকদের সামনে এক বিশেষ লক্ষ্য বর্তমান। কিন্তু সেটা কোন পারলৌকিক মুক্তি কিংবা স্বর্গ লাভ নয়; বরং বিদ্যমান সমাজের বিভিন্ন কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখের বহু ঊর্ধ্বে সাধকদের নিজের দেহেরঅভ্যন্তরের সত্তার অনুসন্ধান। নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মনের মানুষের সন্ধানই হলো তাদের পরম লক্ষ্য। ঠিকএই কারণে বাউল সাধনার প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান।অতীন্দ্রিয় সত্তায় বাউলেরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। এর কারণে নিজেদের দেহকেন্দ্রিক উপলব্ধির সাধনা করেন,ফলে কেবল বর্ণাশ্রম ও সামাজিক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, এর অন্তরে নিহিত ছিল মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণকারী কাঠামোর বিরুদ্ধেও একটি মৌলিক প্রশ্ন। লালন ফকিরের বিভিন্ন গানের মাধ্যমে এটা প্রতিফলিত হয়েছে বারংবার– "কার বা আমি, কে বা আমার/প্রাপ্ত বস্তু ঠিক নাহি তার"[২]। এই পঙক্তিটিরমাধ্যমে তিনি সামাজিক বিভাজনের অসারতা তুলে ধরেছেন।

ইউরোপের নবজাগরণের সময়কালে মানুষ সচেতন সত্তা হিসেবে একটি নির্দিষ্ট মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলেছিল। ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যখন উত্থান ঘটেতখন মানবতাবাদী চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল। যদিও সেটি সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ছিল না। বাউল ধর্মের মৌলিক ভিত্তি ছিল সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার ধারণাটি মূলত মানবীয় নারী পুরুষের মধ্যেকার পবিত্র প্রেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই প্রেমে রাধা-ভাবাপন্ন মানব সত্তা এবং কৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমলীলার প্রতীকী পুনঃনির্মাণ হিসেবে ব্যাখ্যা হয়। অন্যদিকে বাউলদের কাছে তাদের অন্তর্নিহিত চিরন্তন পরমাত্মারূপই হলো আসল প্রেম। এই সত্তাকেই তারা 'মনের মানুষ' নামে অভিহিত করেছেন। সুফি দর্শনের ঈশ্বর অনুসন্ধানের সঙ্গে এই বাউলদের মনের মানুষের মিলনের যে গভীর আকুতি কিংবা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয় তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বাউল সাধকলালন মানবের এই সত্ত্বাটিকে রতনের সঙ্গে তুলনা করেন এবং তাকে যতন করে রাখার উপদেশ দিয়েছেন। দেহ হল বর্তমান এবং মনের মানুষ এর উৎস, অবস্থান, সন্ধান, প্রাপ্তি মানবদেহের মধ্যেই লভ্য এবং তাকে দেহ সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়। অনেক মানুষ শুধু কেবলমাত্র বুদ্ধি বাধারণার মাধ্যমে মনের মানুষকে ব্যাখ্যা করতে চান, কিন্তু বাউল সেই

সীমা অতিক্রম করে যায়। যদি কোন মানুষ সঠিক সাধনার মাধ্যমে কামনা বাসনা সুখ-দুঃখের গণ্ডি অতিক্রম করে প্রেমকে পেতে পারে তখন সেই সাধক অন্তঃস্থিত ঈশ্বরীয় সত্তায় উপনীত হয় এবং সাধককের প্রকৃত সত্তাই তার একমাত্র সত্তা হয়ে ওঠে। এটা লালনের ভাষায় "মনের মানুষ খেলছে দ্বি দলে।/যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে।।/ও সে দল নিরূপণ হবে যখন/মানুষ ধরা যাবে তখন/জনম সফল হবে রূপ দেখিলে।।"[৩] এইভাবেই দেহকেন্দ্রিক সাধনার মাধ্যমে বাউলদের চেতনার আত্মগত স্তরের উত্তরণ ঘটে। ঠিক এভাবেই বাউলেরা নিজের ভেতরকার মনের মানুষের সন্ধান করতে গিয়ে আর একটা সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে যাকে তারা 'ভোলা মন' আখ্যা দেন। এই ধারণার সূত্রটির হাত ধরে 'ভোলা মন' শব্দবন্ধটাবাউল গানের এক অভিন্ন পরিচয়চিহ্ন হয়ে উঠেছে। এই বাউল সঙ্গীতের মধ্যে 'মন' ও 'মনের মানুষ'-এর মধ্যে একটা দ্বৈতভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও সাধকরা জানে এই ভাবাবেগ প্রকৃত ভাব নয় নিজের মধ্যে অধরা মানুষকে ধরাই একমাত্র সাধনা এবং তার জন্য এই দ্বৈতভাবকে সরিয়ে দেহ ও মনের মিলন ঘটানোই সাধকের সবথেকে চরম ও একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন ব্যাক্তি, মন এবং দেহ এগুলিকে পৃথক বলে মনে হওয়া সত্তাগুলি একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়, তখনই সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং বাউলেরানিজের মধ্যে থাকা প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পান ও সাধকের সাথে এই মনের সম্পর্ক কখনও বা বিচ্ছেদ আবার কখনও বা সংযুক্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। এই পরিবর্তনীয় গতিশীল পথের মধ্যে দিয়েঅনুসন্ধান এগিয়ে চলে। কিন্তু বাউল সাধনার সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো মনের মানুষের যে প্রাপ্তি সেই উপলব্ধিটিকে ধরে রাখা। এইভাবেই মনের মানুষের অনুসন্ধান বাউলের কাছে কোন সমাপ্তি নয় বরং বলা যেতে পারে সমগ্র জীবনব্যাপী এক অবিরাম অন্বেষণ। জীবন নিজেই সাধনার রূপ ধারণ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্যে বিভিন্নভাবে বাউল ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায়। বাউলের 'মনের মানুষ' তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতার' সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়। তাঁর বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্যে বারংবার বিভিন্নভাবে বাউলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি এক কবিতায় লিখছেন- "তরুণ যৌবনের বাউল/সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে, /ডেকে বেড়ালো/নিরুদ্দেশে মনের মানুষকে অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।"[৪] ধীরে ধীরে এইভাবেই 'রবীন্দ্রবাউলে' তিনি রূপান্তরিত হয়েছিলেন। শিয়ালদহে কবি বিভিন্ন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী ও বাউলদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সাথে বাউলের এক অন্তরঙ্গ পরিচিতি তৈরি হয়। এমনকি আজকের এই বাংলায় যে লালন সম্পর্কে এত উৎসুক তার জন্যও বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথই দায়ী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রবাসী' পত্রিকায় ও 'গোরা' উপন্যাসে প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করেছিলেন। "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়" - লালনের এই গানটি জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে 'The philosophy of our people' শীর্ষক সভাপতির ভাষণে 'অচিন পাখির' উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এর পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বক্তৃতায় লালনের বিভিন্ন গানের উল্লেখ করেন তিনি।

শিলাইদহের জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে লালন শাহের আধ্যাত্মিক গানের এক গভীর যোগসূত্র তৈরি হয়। লালনের সংগীতের সহজবোধ্য ভাষা অথচ উচ্চমার্গের দর্শন তাঁকে গভীরভাবে বিমোহিত করেছিল। মূলত শিলাইদহ যাপনের সেই দিনগুলোতেই তাঁর সৃজনশীল সত্তায় লালনের দর্শনের এক শক্তিশালী প্রভাব পড়ে। মজার বিষয় হলো, শিলাইদহ ডাকঘরের পিয়ন এবং বাউল কবি গগন হরকরাকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। লালনের পর গগন হরকরার সৃষ্টিকর্মই তাঁকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল।

গগনের কালজয়ী গান— "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে"[৫]— রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর হাত ধরেই প্রবাসী পত্রিকায় বিখ্যাত 'হারামণি' বিভাগের যাত্রা শুরু হয়, যেখানে বাউল গানের অমূল্য রত্নগুলো সংরক্ষিত হতে থাকে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কবির বাউল ভাবধারার বিকাশে লালন ফকির ও গগন হরকরার অবদান অনস্বীকার্য। গগন হরকরার সেই গানটির সুর ও বাণীর প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে, তা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা'[৬] গানটি রচনা করেন।

'হারামণি'র মুখবন্ধে গগনের গানটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, গানের কথাগুলো সরল হলেও সুরের মূর্ছনায় তা এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, উপনিষদের গূঢ় তত্ত্বগুলোই যেন গ্রামবাংলার বাউলদের মুখে 'মনের মানুষ' হিসেবে সহজভাবে ধরা দিয়েছে। উপনিষদের 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' কথাটির সঙ্গে বাউলদের এই 'মনের মানুষ' খোঁজার যে বিস্ময়কর মিল, তা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করত।[৭] প্রকৃতপক্ষে, শিলাইদহ ছিল বাউল-বৈষ্ণবদের এক মিলনমেলা, আর তাঁদের সাহচর্যেই কবির জীবনদর্শনে এক মরমি ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ফলে এটা বলা যেতেই পারে শিয়ালদহের বাউল সম্প্রদায়ের থেকে প্রেরণা পেয়ে তিনি রবীন্দ্র বাউলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে বাউল ভাবের পরিচয় স্পষ্ট, সে তার শিল্পকর্মে হোক কিংবা পোশাক পরিচ্ছদে। সব বাউলদের মতো তিনিও বাইরের ধর্মকে অস্বীকার করে অন্তর ধর্মকেই আপন ধর্ম বলে মনে করতেন। নিজেকে জানার এই ধর্মই হলো বাউল ধর্ম। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন "আমার ধর্ম কি, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলে পারিনে -অনুশাসন আকারে তত্ত্ব আকারের কোন পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো নয়।"[৮] বাউলের যে প্রধান বাণী মনের মানুষের অন্বেষণ রবীন্দ্রনাথ সেটিকেই নিজের জীবনে ধারণ করেছিলেন তার ধর্ম চিন্তায়। তিনি বলেছেন, "বিশ্ব দেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ চন্দ্র তারায়।"[৯] ক্ষ্যাপা বাউলরা যেমন সারা জীবন ঘুরে ঘুরে নিজের মনের মানুষের সন্ধান করে রবীন্দ্রনাথও ঠিক যেন তার মনের মানুষের সন্ধান চালিয়ে গেছেন সারা জীবন ধরে। তাই তিনি নিজেকে সমর্পণ করতে গিয়ে বলেছেন "আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন/সকল মন্দিরের বাহিরে/আমার পূজা আর সমাপ্ত হল/দেবলোক থেকে/মানবলোকে,/আকাশে, জ্যোতির্ময় পুরুষে/আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের 'পটপুট' কবিতাটির - "কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে/একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মা নদীর ধারে,/...দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে/মনের মানুষকে সন্ধান করবার/গভীর নির্জন পথে..."[১১] এই লাইনগুলি দেখলেই বোঝা যায় তাঁর দর্শন চিন্তায় বাউল ভাবধারার কতখানি প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকের ক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ্য করে দেখি তাহলে বুঝতে পারা যাবে যে বেশিরভাগ নাটকের প্রধান চরিত্র হিসেবে বাউল ধরনের একটি বিশেষ কোন চরিত্রকে অবলম্বন করে পরিণাম সুসজ্জিত করার একটা তাই প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল। যেমন-'ফাল্গুনীর' সেই অন্ধ বাউলের কথা বলা যায়।

'শান্তিনিকেতন' ভ্রমণাবলীর অন্তর্গত 'ছোটো ও বড়ো' নামের একটি রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের সত্যরূপটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা যা বলেছেন, তার প্রধান বক্তব্য হলো মনের মানুষকে 'কোথায় পাওয়া যাবে?' তার সন্ধান করতেই যেমন বাউল সাধকরা জীবন কাটিয়ে দেন, তার জীবনেরও অন্বেষণ সেই সন্ধানে সমধর্মীয়। অন্যদিকে 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির প্রত্যেকটি পঙক্তি যেন তার জীবন দেবতার ধারণাকে গভীরতর দার্শনিক করে তুলেছিল।বাউল প্রেম এই মনের মানুষের প্রতি অনুরাগ সব মিলিয়ে তার বিভিন্ন

নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছিল এক বাউল। ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদা ঠাকুর, অন্ধ বাউল...ইত্যাদি চরিত্রগুলি জীবনের সহজ সরল পথ, সামাজিক ক্রীড়া প্রতিক্রিয়া ত্যাগ করে মোক্ষের বার্তা বয়ে বেড়িয়েছে।

বাংলার এক অভিন্ন লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বাউল গান দীর্ঘদিন যাবত সমাজে চলে এলেও শিক্ষিত সম্প্রদায় এর তেমন কোন সন্ধান জানতেন না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে সর্বপ্রথম এই গানগুলি শিক্ষিত জনসমাজের প্রচারিত হয়েছিল। তিনি এই গানগুলির কাব্য মূল্য বিচার করে তার নিজের অন্তরে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। উপনিষদ ও বিভিন্ন সন্তদের বাণীর পাশেই তিনি স্থান দিয়েছিলেন নিরক্ষর বাউলের বাণী। তাঁর ধারণা ছিল বাউলরা কবীর-নানক প্রভৃতি সন্তদের মতোই মোক্ষের পথের সাধক ছিলেন। সন্ত ও বাউলদের মতবাদের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও বাউল কিন্তু সন্তদের কাছ থেকে ধর্ম কিংবা মতবাদ গ্রহণ করেননি। এই সাধনাটি বিশেষভাবেই বাংলাদেশের নিজস্ব। 'বাউল গান' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে তার অন্তরে গভীর যুগ ছিল বাউল গানের সঙ্গে। তাঁর মতে অহং বিন্যাসের ফলে প্রকৃত প্রেম পাওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ বাউল গানগুলির মধ্যে জটিলতাকে বাদ দিয়ে সহজভাবে কবিত্তময় গানগুলি নির্বাচন করে নিয়ে রস উপভোগ করেছেন। তার জন্যই ধর্মদর্শন ও সাহিত্যের বিচারে বৈষ্ণব বা শান্তদের তুলনায় বাউল গান রবীন্দ্রনাথকে বেশি পরিমাণ মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি বাউল নাম দিয়ে যে স্বদেশী গানগুলোর রচনা করেছিলেন তাদের বেশির ভাগটাই বাউল সুরে রচিত হলেও সবগুলি কিন্তু ছিল না। তবুও সবগুলোকেই বাউল নামে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি কারণ তিনি দেখেছিলেন এই বাউল সম্প্রদায়ের সাধকরা জনসাধারণের দরজায় দরজায় ঘুরে গান উচ্চারণের মাধ্যমে তত্ত্বকথা ও ধর্ম ভাব পরিবেশন করেনএবং তাদের ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবের এক সুদৃঢ যোগ সূত্র দেখা যায়। তিনি লিখেছেন– "আমার মন, যখন জাগালি না রে, তোর মনের মানুষ এল দ্বারে"[১২]। রবীন্দ্রনাথের মনের মানুষের প্রতি যে মনের আকুতি ভাব তা প্রকাশ করে তিনি লিখছেন- "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,/তাই হেরি তাই সকল খানে।।"[১৩] আবার কখনো বাউলের তত্ত্বকথা কে অবলম্বন করে বিভিন্ন নতুনত্ব সৃষ্টি করার অনুপ্রেরণাও পেয়েছিলেন তিনি। "অচিন পাখি তুমি/মিলনের খাচায় থাক/নানা সাজের খাঁচা।/সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,/স্থকিত ওড়ার মধ্যে।"[১৪]

বাউল গান এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যে যে মিল দেখা যায় সেটা খানিকটা প্রভাবগত হলেও সম্পূর্ণরূপে নয়, বরং উভয়ের জীবনদর্শনের প্রতি যে ধারণা তাসুদৃঢ় ঐক্য ছিল। তাই ভারতীয় দার্শনিক সংঘের অধিবেশনে মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এই ভাবটির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- "আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ..."[১৫]।

পরিশেষে এটা বলা যেতেই পারে বৈষ্ণব পদাবলী তাঁকে যথাসাধ্য আকৃষ্ট করলেও তার মনে বিশেষ স্থান পায়নি। তার হৃদয়ে বাউল সাধনা ও বাণী যে কতখানি দাগ কেটেছিল তা আরো স্পষ্টভাবে ধরা পরে ১৩২২ সালে প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর সম্পাদনায় বাউল গুরু লালন ফকিরের ১৯ টি গান প্রকাশিত হয়। তিনি বুঝেছিলেন যদি সবথেকে সহজ মুক্তির সাধনার পথ কিছু থেকে থাকে তাহলেসেটা হলবাউল সাধনার পথ।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গোরা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬৯,বিশ্বভারতী, পৃ. ৭।
২. দাশ, ডক্টর শ্রী মতিলাল ও মহাপাত্র, শ্রী পীযূষকান্তিবিশ্বভারতী। লালন গীতিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, কলিকাতা, পৃ. ২৮৬।
৩. দাশ, ডক্টর শ্রী মতিলাল ও মহাপাত্র, শ্রী পীযূষকান্তিবিশ্বভারতী। লালন গীতিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, কলিকাতা, পৃ. ৫৫-৫৬।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।শেষ সপ্তক। রবীন্দ্ররচনাবলী (৩য় খণ্ড), বিশ্বভারতী প্রেস, ১৯৮৩, শান্তিনিকেতন, পৃ. ২১১।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আশীর্বাদ, উদ্দীন, মনসুর, মুহম্মদ, 'হারামণি' (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৩৭৮, পৃ. ৩।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আশীর্বাদ, উদ্দীন, মনসুর, মুহম্মদ, 'হারামণি' (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৩৭৮, পৃ. ৩।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আশীর্বাদ, উদ্দীন, মনসুর, মুহম্মদ, 'হারামণি' (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৩৭৮, পৃ. ৩।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২৭), বিশ্বভারতী, ১৩৮১, পৃ. ২৩৫।
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২৭), বিশ্বভারতী, ১৩৮১, পৃ. ২৪২।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'পত্রপুট' (পনেরো পরিচ্ছদ), রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২০), বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, পৃ. ৪৮।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'পত্রপুট' (পনেরো পরিচ্ছদ), রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২০), বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, পৃ. ৪২।
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৩১, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৫৫০।
১৩. রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৩১, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৫৪৯।
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শেষসপ্তক, রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ১৮), বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, শান্তিনিকেতন, পৃ. ১৬২।
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২০), বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৩৯০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. উদ্দীন, মনসুর। মুহম্মদ হারামণি (২য় খণ্ড)- 'আশীর্বাদ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৭৮, ঢাকা।
২. কবিরাজ, শ্রী গোপীনাথ। ভারতীয় সাধনার ধারা। সংস্কৃত কলেজ,১৯৬৫, কলিকাতা।
৩. গুপ্ত, অমিত। বাংলার লোকজীবনে বাউল।সংবাদ,১৯৭৮, কলকাতা।
৪. চক্রবর্তী, সুধীর। ব্রাত্য লোকায়ত লালন। পুস্তক বিপণি,১৯৯২, কলকাতা।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী (১-১৪ খণ্ড)। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, কলিকাতা।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ১৮)। ১৩৭৪, বিশ্বভারতী।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গোরা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,১৯৬১, বিশ্বভারতী।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম। বিশ্বভারতী, ১৩৩৯, শান্তিনিকেতন।
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান। বিশ্বভারতী, ১৯৩১, শান্তিনিকেতন।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।সংগীত চিন্তা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,১৩৯৯, কলিকাতা।
১১. দত্ত, ভাবতোষ।বাংলা গীতিকাব্যের আদিপর্ব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,১৩৯৮, কলকাতা।

১২. পাঠক, সুনীতিকুমার।বাউল খোঁজে মনের মানুষ। অর্পিতা প্রকাশনী,১৯৯৭, কলকাতা।
১৩. বসু, অরুনকুমার। রবি– বাউলের উৎসমুখে। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ সংকলন), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৩৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
১৪. ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ। বাংলার বাউল ও বাউলগান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৭৮, কলিকাতা।
১৫. মিত্র, শ্রী সনৎকুমার। লালন ফকির, পুস্তক বিপণি, ১৩৮৬, কলিকাতা।
১৬. রায়, অভয়পদ। বাউল পদাবলী, ১৪০০ প্রকাশনী, বোলপুর, ১৪০১, বীরভূম।
১৭. রায়, শ্রী অমরেন্দ্রনাথ। শাক্ত পদাবলী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১, কলিকাতা।